বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

হলদিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয়

বিষয়-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পে ভৌতিকরস

বিভাগ-বি.এ জেনারেল

নাম-সুদীপ্তা দাস

শ্রেণী-তৃতীয় বর্ষ (ষষ্ঠ সেমিস্টার)

রেজিস্ট্রেশন নাম্বার-১১৬০৩৬৪ বর্ষ-২০২০-২০২১

পেপার-SEC-4

ক্রমিক সংখ্যা-HGC/BAGEN/20/104

শিক্ষাবর্ষ-২০২২-২০২৩

Head
Department of Bengali
Haldia Govt. College
West Bengal Education

Department of Bengali

Haldia Government College

Debhog, Haldia, Purba Medinipur

Ref. No: BNGG/P/2022-2023/03 Date:

Project Completion Certificate

This is to certify that .....Supipta Das.....

with University Registration no...**1160364** of **2020-2021**(session)

a student of Semester-**VI** has successfully completed the project work entitled .....**Rabindranath Thakurer Chotogalpe Bhotik Ras**.....for partial fulfillment of B.A.(G) degree in the academic year 2022-2023.

It has been noticed that during the course, the candidate was regular and has a keen interest to the project work.

I wish her every success in life.

24-07-23

Project Supervisor

Assistant Professor
West Bengal Education Service
Department of Bengali
Haldia Government College

24.07.2023

Head, Department of Bengali

Head
Department of Bengali
Haldia Govt. College
West Bengal Education Service

—: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—

আমি সুদীপ্তা দাস, হলদিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ সেমিস্টারের বাংলা বিভাগের একজন ছাত্রী, বাংলা বিভাগের SEC পেপারের প্রকল্পের জন্য আমি "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পে ভৌতিকরস" এই বিষয়টি নির্বাচন করেছি, আমার এই প্রকল্পটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগের সম্মানীয় অধ্যাপক/অধ্যাপিকা, অধিক্ষ সহ বিভাগীয় প্রধান এবং সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণ আমাকে বিশেষভাবে সহযোগীতা করেছেন, তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

এছাড়াও আমার সহপাঠীগণ আমাকে এই প্রকল্পের বিষয়ে বিশেষভাবে সহযোগীতা করেছে তাই তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে বলা যায় যে আমার এই প্রকল্পসম্পর্কিত কাজটি যদি যথেষ্ট অপেক্ষায় পরিপ্রেক্ষিতে অনন্য হলেও কাজে আসে, এবং এই অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করে আনন্দিত হব।

সুদীপ্তা দাস

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

—: সূচীপত্র :—

বিষয়সূচী	পৃষ্ঠা
① ভূমিকা	১
② অতিপ্রাকৃত গল্পকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	২
③ কঙ্কাল	৩ – ৪
④ জীবিত ও মৃত	৫ – ৭
⑤ খুঁজিতে পাষাণ	৮ – ৯
⑥ মণিহারা	১০ – ১১
⑦ মাস্টার মশায়	১২ – ১৩
⑧ উপসংহার	১৪
⑨ সহায়ক গ্রন্থ	১৫

ভূমিকা :-

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতেই বাংলা ছোটগল্পের আধুনিক রূপটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। 'সাধনা' পত্রিকায় তিনি প্রথম ছোটগল্প লিখতে শুরু করেন। তার আগেও অবশ্য তিনি গল্প লিখেছেন। যাঁরা শুধু সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত থাকেননা, সৃষ্টিকে আপন প্রতিভা বলে গৌরবের হেমশীর্ষায় স্থাপন করেন, তেমনই এক অসামান্য স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "সোনার তরী" কাব্যের "বর্ষাযাপন" কবিতায় ছোটগল্পের রূপ নির্মিত ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী অসংখ্য আধুনিক ছোটগল্প রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে মানুষ, প্রকৃতি ও অন্তহীন রহস্যলোকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের নানা ছবি, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনদশা, পারিবারিক বিরোধ, খেত মজুরের সংঘাত, সংস্কারের সঙ্গে সনাতন ধর্মের বিরোধ প্রভৃতি বর্ণনা করা হয়েছে তার গল্পে।

অতিপ্রাকৃত গল্পকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর:-

বাংলা ভাষার সাহিত্যিকরা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাদের লেখনীতে নিয়ে এসেছেন ভূত বা অশরীরী; তবে রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্পে প্রত্যক্ষভাবে ভূতের আবির্ভাব ঘটেনি, তার গল্প বলার ঢংয়ের কারণে ভৌতিক আবহ তৈরি হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে অশরীরীকে উপস্থাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি এমনভাবে তার ভৌতিক গল্পগুলো সৃষ্টি করেছেন যাতে করে সেই গল্পগুলোকে মনোস্তাত্ত্বিক গল্প হিসেবেও চালিয়ে দেওয়া যায়, মানে পাঠক যেটা করলে গল্পের ভেতরে একটা যৌক্তিক ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে ভূতকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারেন।

"ক্ষুধিত পাষাণ", "মণিহারা", "কঙ্কাল", "খোকাবাবুর", "জীবিত ও মৃত" প্রভৃতি অতিপ্রাকৃত কাহিনীমূলক গল্পে ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি হলেও অশরীরী আত্মার আবির্ভাব নেই, আছে বিকারগ্রস্ত মানুষের অন্তর্জীবনের পরিচয় - এ দিকের মনোস্তত্ত্বঘটিত অতিপ্রাকৃত গল্পের স্রষ্টা হিসেবে তার অবদান অসামান্য।

কঙ্কাল :-

রবীন্দ্রনাথের 'কঙ্কাল' ছোটোগল্পটি একটি কঙ্কালের জীবিতকালের গল্প, প্রত্যেকটি কঙ্কালই একসময় আমাদের মতো মানুষ ছিল, তার একটি জীবনপ্রবাহ ছিল, আর সেই প্রবাহে সুখ-দুঃখ, আনন্দ বেদনা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে ছিল, একজন চিকিৎসক বা চিকিৎসাবিদ্যার একজন শিক্ষার্থী যখন একটি নরকঙ্কাল নিয়ে কাজ করেন, তিনি কি কখনো সেই কঙ্কালের অতীত নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন, ~~জীবিত~~ জীবিতকালের চিত্রকল্প কল্পনা করার প্রয়াস করেন? রবীন্দ্রনাথ সেটা করেছেন, আর তা ফুটিয়ে তুলেছেন এক অকালপ্রয়াত তরুণীর ব্যর্থ প্রেমের গল্প দিয়ে,

'কঙ্কাল' গল্পে আত্মমুগ্ধতায় বিহ্বল এক রূপবতী যুবতীর জীবনের আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। গল্পের কথকের বাড়িতে একসময় একটি নরকঙ্কাল ছিল এবং তিনি সেই কঙ্কালের সাহায্যে অস্থিবিদ্যা শিখতেন। কালের আবর্তনে কঙ্কালটি বাড়ি থেকে হারিয়ে যায়, আর খ্যাতনামা কথকও কঙ্কালের অস্তিত্বের কথা ধীরে ধীরে ভুলে যান। কিন্তু একদিন

কোনো কারণে কথককে বাধ্য হয়ে একসময় কঙ্কালের আবাসস্থল সেই ঘরে রাতের বেলা ঘুমাতে হয়। অন্ধকার ঘরে শুয়ে কথক ঘরের ভেতর দ্বিতীয় কারো উপস্থিতি অনুভব করেন। ভীত সন্ত্রস্ত কথক যখন সেই আগন্তুকের উদ্দেশ্যে 'কে' বলে প্রশ্ন করেন তখন উত্তর ভেসে আসে, 'আমি, আমার সেই কঙ্কালটা কোথায় গেছে তাই খুঁজতে এসেছি।

গল্পের শেষে এসে দেখা যায় সেই আগন্তুক প্রেত রমণী নিজের জীবিতকালের ব্যর্থ প্রেমের আগ্রহ ভরা কাহিনী জানাচ্ছেন কথককে। অসামান্য সুন্দরী হওয়ায় তার নিজের রূপের জন্য অহংকার ছিল, নিজেকে নিজেই ভালোবেসেছিলেন তিনি। অসংখ্য পুরুষজাতি তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে মাতাল হয়ে আসত, এই ধারণা যখন সেই সুন্দরী রমণীর মনে বদ্ধমূল হল তখনই তিনি প্রেম করলেন এক ডাক্তারের, কিন্তু সেই ডাক্তারই যখন এই নারীর নীরব প্রেমের নারী নয়ন ধরতে না পেরে অন্যত্র বিয়ে করার আয়োজন করলেন, তখন ব্যর্থ প্রেমিকা নিজের হাতে প্রেমিককে [illegible] বিষপানে খুন করলেন, এবং সাথে সাথে নিজেও আত্মহত্যা করেন।

গল্পটিতে ভয়ের চেয়ে বেদনাবোধই বেশি ফুটে উঠেছে।

জীবিত ও মৃত:-

'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই'
এই বিখ্যাত লাইনটি রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত' গল্পের অংশ। এই গল্পটিতে কাদম্বিনীকে মরে গিয়ে প্রমাণ করতে হয় যে সে মরেনি।

কোনো অজানা কারণে জমিদার বাড়ির বিধবা বউ কাদম্বিনীর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেলে তাকে মৃত ভেবে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় দাহ করানোর জন্য। অন্ত্যেষ্টির শ্মশানে যখন সৎকার কার্য শুরু করার জন্য মৃতদেহের সামনে লোকেরা অপেক্ষা করছিল, এমন সময় কাদম্বিনী পুনরায় জেগে ওঠে। শ্মশানের অন্ধকার ঘরে হঠাৎ এরকম অবিশ্বাস্য ঘটনায় ভয় পেয়ে মৃতদেহ ফেলে রেখে শ্মশান ত্যাগ করে লোকজন চলে যায়, আর প্রচার করে কাদম্বিনীর সৎকার ও কাজ ভালোভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে।

এদিকে অভাগী কাদম্বিনী রাতের অন্ধকারে শ্মশানঘাট ত্যাগ করে সারারাত হেঁটে তার এক বাল্যকালের সখীর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়, সেখানে আপাতত নিশ্চিন্ত জীবন-যাপন করলেও একসময় যখন বাড়ীর স্বামী খোঁজ নিয়ে জানতে পারে কাদম্বিনী সমাজের চোখে অনেক আগেই মৃত, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাকে ঠিকে নেয় মৃত কাদম্বিনী দুনিয়ার মায়া এখনো ত্যাগ করতে না পেরে প্রেতাত্মা হয়ে তাদের সাথে বাস করছে।

বাল্যকালের প্রিয় বান্ধবীর কাছেও যখন কাদম্বিনী ভূত হিসাবে পরিচিত হলো তখন তার আর কোথাও যাওয়ার স্থান রইল না, কারণ সমাজে ততদিনে জেনে গেছে কাদম্বিনীর মৃত্যু হয়েছে, সুতরাং এই সমাজের যে কারোই কাদম্বিনী যাক না কেন তার আর কোথাও ঠাঁই হবে না, 'মানুষ ভূতকে ভয় করে, ভূতও মানুষকে ভয় করে, মৃত্যুনদীর দুই পারে দুই-জনের বাস'; আর এই দুইয়ের মাঝে কাদম্বিনীর অবস্থান। সুতরাং না পারছে সে নিজেকে প্রেতলোকে সমর্পন করতে, না পারছে সমাজে নিজের জীবিত সত্তাকে প্রমাণ করতে।

অবশেষে অনেক দ্বিধাগ্রস্ত, নিজের অস্তিত্ব নিয়ে বিভ্রান্ত কাদম্বিনী পুনরায় সবার চোখ এড়িয়ে নিজের বাড়িতে পৌঁছালো, হয়তো ভেবেছিল নিজের আত্মীয় পরিজন তাকে বিশ্বাস করবে, তার অস্তিত্বকে মেনে নেবে। কিন্তু, মানুষ সামাজিক জীব, তাই সমাজের প্রতিষ্ঠিত সত্যকেই সেই সর্বাগ্রে মান্য করে, অনেক সময় সেই সত্যের ভেতরে সত্যকে খোঁজার প্রয়োজনীয়তা মোটেই বোধ করে না। অবশেষে নিজের ঘরনখায় নিয়েও যখন কাদম্বিনী নিতান্ত আশ্রয়টুকু পেলো তখন মৃত্যুর মতো অমোঘ সত্যকে অবলম্বন করেই তাকে নতুন একটা সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হলো, কাদম্বিনী নিজেকে মেরে প্রমাণ করে ছাড়লো যে সে আসলে মরেনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবিত ও মৃত' গল্পটিকে একেবারে ভূতের গল্প বলা যায় না, কারণ এখানে সত্যিকারের কোনো ভৌতিক চরিত্র নয়, বরং মানুষের মনের অবচেতনে লুকিয়ে থাকা ভূতকে টেনে তুলে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ। গল্পের মূল চরিত্র কাদম্বিনীকে মৃত ভেবে সবাই তার উপস্থিতিকে ভৌতিক হিসেবে ধরে নেয়, আর তা সত্য করতে না পেরে অবশেষে কাদম্বিনীকে পুনরায় মরে গিয়ে প্রমাণ করতে হয় যে সে আসলে মরেনি।

স্মৃতির শ্মশান:-

পাহাড়ের গা ঘেঁষে বিরাজমান, আপাত পরিত্যক্ত কোনো রাজপ্রাসাদ যদি গল্পের মূল বিষয়বস্তু হয় তবে সেই প্রাসাদে ভূত থাকবে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর যখন রবীন্দ্রনাথ এরকম ভৌতিক প্রাসাদ নিয়ে কিছু লিখবেন, সেখানে অতি অবশ্যই পাঠক ভিন্ন স্বাদের ভূতের গন্ধ পাবেন।

'স্মৃতির শ্মশান' গল্পে একটি প্রাচীন রাজপ্রাসাদের অশরীরী আবেশকে রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন। রাজপ্রাসাদের ভূতগুলোর সাধারণত একটা রুল থাকে। মোদ্দা কথা হলো, যেকোনো বাড়ির ভূতেরই একটা না একটা রুল থাকবে। আর সেই রুল ধরে মাঝে মাঝে বাড়ির সদস্যদের জ্বালিয়ে মারবে, এটাই নিয়ম।

আজ থেকে প্রায় একশো কুড়ি বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারটাকে একটু ভিন্নভাবে, রবীন্দ্রসুলভভাবেই ভেবেছেন। তিনি আলাদা কোনো ভূত বা প্রেতাত্মাকে পুরো প্রাসাদ একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে আঁকিয়ে বসাননি, বরং সেই অশরীরীকে প্রাসাদের সাথেই একাত্ম করে দিয়েছেন, মানে সমস্ত প্রাসাদটিই আলাদা একটি প্রেতাত্মা হয়ে উঠেছে।

গল্পটিতে ভারতবর্ষের বড়ো নামক স্থানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তৈরি নদীর ধারের একটি

শ্বেত প্রাসাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড কুঠারে ক্ষত হয়ে আছে, সজীব মানুষ সেইখানে তাকে কালোয়িত শিকারীর মতো মেরে ফেলিতে চায়; প্রাসাদের পুরোনো কালের ফাটল জামা অভিমানেই পুরো প্রাসাদটিকে একটি জীবন্ত অস্তিত্ব রূপে পরিণত করেছে, আর এই অরণ্যবীথির হাত থেকে বেঁচে ফেরার দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন গল্পের কথক।

মণিহারা :-

মণিহারা গল্পটি ফণিভূষণ আচার্য নামক এক শিক্ষিত ধনী ও তার সুন্দরী স্ত্রী মণিমালিকাকে নিয়ে, ফণিভূষণ স্বৈতুক সূত্রে ধনী, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক বাঙালি কিন্তু নিজের বিবাহিত জীবনে তিনি কখনো পুরুষতান্ত্রিকতা ফলাতে পারেননি। তাকে অবশেষে বিনাতর্কে স্ত্রীর আবদার মেটাতে হয়েছিল। ফণিভূষণ স্ত্রীকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন, ফলে কানে কানে স্ত্রী তার মাথায় উঠে বসল। অবস্থা এমন হলো যে, নিজের ব্যবসা রক্ষার জন্য যখন স্ত্রীর গয়না বন্ধক দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে উঠল, তখনও ফণিভূষণ জোর গলায় তা স্ত্রীর কাছে দাবি করতে পারলেন না। ফলে ব্যবসা বাঁচানোর জন্য হতভাগা স্বামীকে কলকাতায় গিয়ে বৈকল্প অলংকারের চেষ্টা করতে হলো।

এদিকে স্ত্রী মণিমালিকা তার নিজের গয়না নিয়ে বিশেষ অতর্ক। তার মনে হলো, তার গয়না বুঝি এবার যাবে। স্বামীর নজর থেকে বাঁচানোর জন্য মণিমালিকা তার গয়নাগুলি নিয়ে বাপের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

কিন্তু নদীপথে যাওয়ার সময় উনি যে গহনাগুলো অনিমেষলিকার কোথায় হারিয়ে ফেলেন তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না।

পত্নী বিয়োগের দুঃখভারাক্রান্ত ও ফনিভূষণ একদিন ঘুমের মধ্যে অলঙ্কার পরিহিত কঙ্কালের হাঁটার শব্দ শুনতে পেয়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। ব্যাপার, এরপরই নিয়মিত ঘরের আশেপাশে তিনি এই শব্দ শুনতে পান। কঙ্কালের হাতের ঘট ঘট শব্দের সাথে সোনার অলঙ্কারের ঝংকৃত শব্দ শুনলে ফনিভূষণকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিল। ঘুমন্ত অবস্থায় একদিন ফনিভূষণ নিজেকে আবিষ্কার করলেন নদীর ঘাটে, যে নদীতে অনিমেষলিকার তার প্রাণপ্রিয় গহনা নিয়ে হারিয়ে গিয়েছিলেন। ফনীভূষণও আর নদী থেকে কোনদিন ফেরে আসেননি।

লেখক ইচ্ছে করলে এর একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারেন। কারণ ঘুমের মধ্যে হাঁটা ব্যাপারটি যেমন বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারেন, তেমনিভাবে প্রিয়জনের মৃত্যুর পর তাকে নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা করলে তার একটি প্রভাবমনের ভেতর তৈরি হতেই পারে। এটিও নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক অভ্যুক্তি কিছু নয়।

মাস্টার মশায়:-

কলকাতার বাবুসমাজের প্রতিনিধি কলাম মধ্যবিত্ত কেরানী- এই দুইয়ের সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গল্পটি এগিয়েছে, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জীর্ণ হরলাল কলকাতায় নিজের পড়ানোখরচ চালানোর জন্য টিউশন খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে ধনী অর্থব মজুমদারের একমাত্র ছেলে বেণুগোপালকে পড়ানোর কাজ পায়, এমন থেকেই গল্পের শুরু, হরলালের সাথে ধীরে ধীরে বেণুর দারুন প্রীতির জন্ম ওঠে, শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের চেয়েও তাদের দুজনের সম্পর্ক বন্ধুর মতো হয়ে যায়, কিন্তু এই সুখ বেশিদিন সয় না, অর্থবান বাবুর বাড়িতে একটি চুরি হয়, এবং বেণুর বাড়ির লোক হরলালকেও সন্দেহভাবে সন্দেহ করেন, ফলে অপমানিত হরলাল কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, মাস্টার-ছাত্রের এক অভাবনীয় দৃশ্যহয়সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটে এমানেই।

এরপর বেশ কয়েক বছর কেটে যায়, বেণুগোপাল ধীরে ধীরে যুবক হয়ে ওঠে, এদিকে হরলালও এক ইংরেজ ব্যবসায়ীর দপ্তরে নতুন কাজ জুটিয়ে নেয়, আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে হর আর বেণুর সম্পর্ক এমানেই ছিন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু হরলালের মায়ের অন্ত্যেষ্টি একদিন নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য

বেণুগোপালকে আবার হরলালের কাছে আসতে হয়। আবারও গুরু-শিষ্যের মিলন ঘটে।

এদিকে বেণুর বাবা অবিনাশ তার প্রথম স্ত্রীবিয়োগের পর পুনরায় বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়, তা মেনে নিতে না পেরে বেণু বিলেত যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অভিভাবকগুলো হরলালের কাছে দাবি রেখে হরলালের পরামর্শে তার ঘর থেকে অফিসের তিন হাজার টাকা নিয়ে সকলের চোখের আড়ালে বেণু একদিন বিলেতের জাহাজে চেপে বসে। এবার নিজের ছায়ার কাছ থেকে প্রতারণার শিকার হয়ে হরলালের আজানা-গোচরে সুন্দর ছিমছাম কেরানী জীবন এক ধাক্কায় ধ্বংস হয়ে যায়। পরাজিত, বিপর্যস্ত, হতাশ হরলাল কলকাতার রাস্তায় একটি ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে অবস্থায় গাড়ির ভেতরে অত্যুষ্ণ করে।

এরপর থেকে সেই গাড়িটিতে রাতের বেলা কোনো যাত্রী এলে আরোহন করলে অশরীরী কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করে।

এই গল্পটিতে আগাগোড়া ভূতের অস্তিত্বহীন পুরো গল্পটিই মূলত অন্যায়ের রাস্তায় চলতে গিয়ে বারবার হোঁচট খাওয়া অর্থবিত্ত হরলালের গল্প, এখানে বাস্তবিক ভূতের কোনো স্থান নেই। কিন্তু গল্পের সূচনাতেই রবিবাবু ভৌতিক আবহ সৃষ্টি করেছেন, মূলত 'অলৌকিকতায়' গল্পের ভূতের কোনো কীর্তি নেই, হয়ত ভূত সৃষ্টি হওয়ার পেছনের ঘটনাই এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে।